দ্বিমাসিক
মঙ্গলবার্তা
১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন গঠনের পত্রিকা

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ
যোসেফ বিশ্বাস

❋

সহ-সম্পাদক ঃ
ফাঃ পিও মাত্তেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার
মিঃ সন্তোষ মণ্ডল

❋

সার্কুলেশন ঃ
দাউদ মণ্ডল

❋

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

পৃথিবীটা সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের একটা উপহার এবং তা সকলের সাথে সমানভাবে সহভাগিতার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট। প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের সন্তান আর মর্যাদার অধিকারী। মর্যাদা প্রাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ নির্ভর করে পরস্পরের উপর।

আমরা সকলেই এই জগতে আমাদের নিজেদের জন্য আর অন্যদের জন্য সুখ ও পূর্ণতার সন্ধান করি। কিন্তু অভীষ্টে পৌঁছানোর জন্য বিঘ্নগুলি অতিক্রমের সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। আমাদের চিহ্নিত করতে হবে অন্তরায়সমূহ। অনেক বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের রয়েছে অনেক সুযোগ-সুবিধা, যা দিয়ে আমরা আমাদের পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি।

এই নতুন পৃথিবীকে যীশু ঐশরাজ্যরূপে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে ঈশ্বর হবেন পরিচালক, আর মানুষ তার অধীনে পরম আনন্দ ও শান্তিতে বসবাস করবে। এখানে বন্দীত্ব, নির্যাতন, রোগব্যাধি, মানসিক ক্লেশ, দাসত্ব আর থাকবে না। থাকবে না অন্যায্যতা। এখানে থাকবে একে-অন্যের প্রতি ভালবাসা। এখানে সকল মানুষই সমান। ঈশ্বরের এই রাজত্ব জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আর সমস্ত মানুষের নিকট ছড়িয়ে পড়বে।

এ বছর মঙ্গলবার্তার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বেছে নেওয়া হয়েছে ভারতের ব্যাঙ্গালোর থেকে NBCLC (National Biblical Catechetical and Liturgical Centre) কর্তৃক প্রকাশিত, ভারতের বর্তমান সামাজিক চ্যালেঞ্জের প্রতি

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

উত্তর নামক ধারাবাহিক প্রকাশনা থেকে। 'Vision and Values for a New Society' নামের মিখায়েল অমালাদাসের মূল লেখাটি একই নামে অর্থাৎ 'এক নতুন সমাজের দর্শন ও মূল্যবোধসমূহ' মঙ্গলবার্তার এবারের এ সংখ্যায় তুলে ধরা হল। ভারতের ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। সেক্ষেত্রে, এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্ব হল খ্রীষ্টের প্রেরণদায়িত্ব। অর্থাৎ ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা। শোষণহীন, বৈষম্যহীন, ন্যায্য ও প্রেমের এক ভ্রাতৃসমাজ গড়তে মণ্ডলী খ্রীষ্টেরই মত আপোসহীন এবং একই সময় মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য ও ঈশ্বরের ক্ষমার মাধ্যমে পুনর্মিলনের জন্য মঙ্গলবার্তার বাহক। ধারাবাহিকভাবে আমরাও আমাদের দেশের বাস্তবতায় নতুন নতুন সঙ্কটে ও সম্ভাবনায় মণ্ডলীর সাড়াদান তথা আমাদের ভূমিকা আরো স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করব।

ভূমিকা

সুখ আর মঙ্গল অর্জনই মানব জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য। প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রথমত: তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে চায়। সে আশা করে, তার পর্যাপ্ত খাবার ব্যবস্থা থাকবে। সে বাসনা করে, একটি পরিপাটি বসতবাড়ির। সে জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজের প্রত্যাশা করে। সে কিছু মৌলিক আরাম ও চিত্তবিনোদন প্রত্যাশা করে।

মানবজাতি এ ব্যাপারে সচেতন যে, তারা এই পৃথিবীতে একা নয়। তারা একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। তারা একটি বিশাল মানব দলের মধ্যে বেড়ে ওঠে। তাদের প্রাত্যহিক জীবন এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল, যারা খাদ্য উৎপাদন করে, পর্যাপ্ত নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার-সামগ্রী প্রস্তুত করে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যোগাযোগ ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করে। কোন মানুষই নির্জন দ্বীপবাসী নয়।

এমনকি কিছু লোক ভগবান বুদ্ধের সাথে এ ব্যাপারে একমত নাও হতে পারেন যে, জীবনটা কষ্টে পরিপূর্ণ, প্রত্যেককেই কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে। এর কারণ হতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা রোগব্যাধি, অথবা অন্য ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। মানুষ বিভিন্নভাবে অপরের স্বার্থপরতার শিকার হতে পারে। তারা নিজেদের সেই স্বার্থপরতা সম্পর্কেও সচেতন থাকতে পারে, যা অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। মানবজাতি যতটা সম্ভব এই সকল কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে।

এই পৃথিবীর মন্দতা এবং জীবনের অনিশ্চয়তার প্রতি আলোকপাত মানুষকে ঈশ্বর বা অপর জগত সম্পর্কে ভাবায়। যদিও কিছু কিছু লোক এক তরফাভাবে অন্য জগতের উপর জোর দেয়, তথাপি সামগ্রিকভাবে মানুষ জানে যে, এই জাগতিক জীবন কোন না কোনভাবে সেই আলাদা জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এমনকি ধর্মসমূহ, যেগুলো অপর জগতের কথা বলে, এই জগত জীবনকে সেই মত নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে। প্রত্যেক ধর্মই একটি নৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করে। সম্ভবত: হিন্দুধর্ম পরিষ্কারভাবে এই দ্বান্দ্বিকতাকে নির্দেশ করে যখন এটা জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্য হিসেবে প্রস্তাব করে ঃ ন্যায়পরায়ণতা, সম্পদ, বিলাসিতা এবং মুক্তির অন্বেষণ। ন্যায়পরায়ণতা (ধর্ম) অন্য সকল অভীষ্ট লক্ষ্যের অন্বেষণকে বিশ্বজনীন করে তোলে। এটাই হচ্ছে মুক্তির পথ বা চূড়ান্ত পূর্ণতা।

পূর্ণতার অন্বেষণ একই সময়ে ব্যক্তিগত আবার সামাজিক। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার জীবনের এই অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে হয়। তবে এ কাজটি সে করতে পারে একমাত্র এ পৃথিবীতে অন্যদের সঙ্গে তার সহ-জীবনের দ্বারা ও মাধ্যমে। তার জীবন অন্যদের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গঠিত। মানুষ মূলত: সামাজিক জীব। তাদের লক্ষ্যের যে দর্শন তাতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

নিম্নোক্ত আলোচনায় আমরা সামাজিক অভিজ্ঞতা আর মানুষের দর্শন নিয়ে আলোচনা করব। আমরা আরম্ভ করব যে সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে মানুষের বসবাস, সেই বাস্তবতাকে আজকে কিভাবে অভিজ্ঞতা করে তার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দিয়ে ঃ বিভিন্ন সমস্যাএবং টানাপোড়েন। এরপর আমরা দৃষ্টিপাত করব মানুষের নতুন জগত সংক্রান্ত বিভিন্ন দর্শনের প্রতি, যে নতুন জগত তারা সৃষ্টি করতে চায়। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদগুলো বিভিন্ন দর্শন প্রদান করে। আশা করা যায়, এ সকল দর্শন মানবতার জন্য একটি অভিন্ন দর্শনে একমত হতে আমাদের সাহায্য করবে।

এ ধরনের একটি সমাজের প্রেক্ষাপটেই আমরা প্রতটি ব্যক্তির অবস্থান পর্যালোচনা করে দেখব। এমন কাজ আমাদের সাহায্য করবে মূল্যবোধ ও মনোভাবগুলো, যেগুলো এই জনসমাজ গঠনে অবদান রাখে, সেগুলো ব্যাখ্যা করতে। আর আমরা শেষ করব এ ধরনের লক্ষ্য, মূল্যবোধ আর মনোভাবগুলো কিভাবে সমাজে বিস্তার ঘটানো যায়, তা তুলে ধরার মাধ্যমে।

১

আজকের পৃথিবীর জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা

আমরা সকলেই এই জগতে আমাদের নিজেদের জন্য আর অন্যদের জন্য সুখ ও পূর্ণতার সন্ধান করি। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন, যেগুলি সুখ ও পূর্ণতাকে অনর্জনীয় লক্ষ্য করে তোলে বলে মনে হয়। যে-কোন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সফলতা নির্ভর করে বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠা সম্পর্কিত আমাদের সম্যক জ্ঞানলাভের উপর। তাই আমরা আজকের জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত দিয়ে আরম্ভ করব, চেষ্টা করব দুঃখকষ্ট, পরাধীনতা, নির্যাতনের কাঠামোগুলিকে চিহ্নিত করার, যেগুলি মানুষকে বিভিন্নভাবে দাসত্বে পরিণত করে। মাত্র তখনই আমরা সৃজনশীলভাবে নতুন নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব করতে পারব। প্রতিটি প্রজন্মকে এই অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিতে হবে, প্রতিটি যুগে বিপ্লবকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে। এখন আমরা এই দ্বিমুখি কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করব।

স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য আমরা ভারতীয় (এবং বিশ্বজনীন) সমাজ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করব, আর তা করব ছয়টি দিক নিয়ে গঠিত একটি কাঠামোর মাধ্যমে, যেমন : অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, ব্যক্তি, সংস্কৃতি আর ধর্ম। প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা পরিস্থিতি আর কি বাস্তবমুখী বিকল্প পন্থার প্রস্তাব আমরা করতে পারি, তা বিবেচনা করে দেখব।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক বিবেক

আজকে অর্থনেতিক বিশ্ব ব্যবস্থা উদার পুঁজিবাদ শাসিত। মুনাফাই হচ্ছে এর চালিকা শক্তি। ব্যবসায়ীগণ বাজার নিয়ে ইচ্ছেমত খেলার জন্য অবাধ স্বাধীনতা দাবি করেন। ব্যবসায়ীগণের অন্তরালে হচ্ছেন উৎপাদনকারীগণ। তাদের উৎপাদন অনেক সময় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য পণ্যের উপর আলোকপাত করে না, কিন্তু বস্তুর উপর আলোকপাত করে যা ভোক্তার বাসনার প্রতি সাড়া দেয়। গণমাধ্যমগুলি এ সকল চাহিদা বিজ্ঞাপনের মাধ্যম সৃষ্টি ক'রে এর বিস্তার ঘটায়। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সম্পদের পুঞ্জিভূতকরণ। স্টক বাজারে এ ধরনের সম্পদ কোন রকম উৎপাদনে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়াই শুধুমাত্র ফটকাবাজির মাধ্যমে আরও অনেক সম্পদ উৎপন্ন করে। মুক্ত বাজারের কাজ হল ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সমর্থন করা আর ভোক্তাদের জন্য দ্রব্যমূল্যের দাম নামিয়ে আনা। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি ধরে রাখা আর তাদের মুনাফার মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে, কখনো কখনো অযৌক্তিক মাত্রায়, ব্যবসায়ীরা হয় একচেটে অধিকার আদায় করে কিংবা বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বা নিজেদের মধ্যে ঐক্যজোট গঠন করে। ফলশ্রুতিতে ধনী ও গরীবের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যা একক জাতির ক্ষেত্রে সত্য, তা আন্তর্জাতিক বাজার ক্ষেত্রেও সত্য। ধনী দেশগুলো আরো বিত্তশালী হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলোর কষ্টের মূল্যে। কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী কাঁচামাল ও কৃষিপণ্যের উপর নির্ভরশীল। আজকে ব্যাঙ্ক এবং তথ্যপ্রযুক্তির মত সেবাখাতগুলো ব্যাঙ্কের মত চাকরি এবং তথ্যপ্রযুক্তি কল-কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের চেয়ে বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে। উৎপাদকগণের সঙ্গে তুলনায় ব্যবসায়ীগণ অধিক সুবিধাভোগী। কেননা অর্থনৈতিক কর্তাদের মনোযোগ উৎপাদন, ব্যবসা ও মুনাফার উপর; নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনগণ এবং প্রকৃতির ক্ষতিকে তারা তোয়াক্কা করে না। তথাকথিত মুক্তবাজার বাস্তবিক অর্থে মুক্ত নয়, কেননা নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে এটা বড় বড় কোম্পানী ও ধনী

দেশগুলো কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। শক্তিশালী ও দুর্বলদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘাতে দুর্বলকেই ভূপাতিত হতে হয়। বাণিজ্য আর স্টক মার্কেট অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে উৎপাদনের স্থান দখল করে নিয়েছে। এই সবের নীট ফলাফল হচ্ছে ব্যাপকবিস্তৃত দরিদ্রতা আর দেশগুলোর মাঝে ধনী ও গরীবদের মধ্যে ভোঁতা অর্থনৈতিক অসমতা। এমনকি খাদ্যের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীগুলো বাজারে সহজপ্রাপ্য হলেও লোকদের হাতে এসব ক্রয়ের জন্য টাকা থাকে না, যার কারণ হচ্ছে ব্যাপক বেকারত্ব অথবা স্বল্প বেতনের কাজ বা চাকরি।

বর্তমান জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, আমরা অনেক মূল্যবোধের কথা ভাবতে পারি যেগুলো এই পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। পৃথিবীটা সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের একটি উপহার এবং তা সকলের সাথে সমানভাবে সহভাগিতার অভিপ্রায়ে প্রদত্ত। সকল মানুষ একে-অন্যের ভাই ও বোন এবং এমন একটি জনসমাজ গঠনে আহূত, যেখানে যার যা আছে তা অন্যের সাথে সহভাগিতা করবে, বিশেষ করে যারা অভাবী তাদের সঙ্গে। ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্ট এবং তার নির্দিষ্ট মৌলিক কিছু অধিকার রয়েছে যেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক। এ সকল মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ জীবন ও কাজের অধিকার এবং উপযুক্ত প্রতিফল পাওয়ার অধিকার। এ সকল অধিকারকে বাজারের পণ্যদ্রব্যের ন্যায় ব্যবহার উচিত নয়। পরিশেষে আমাদেরকে অবশ্যই সর্বদা গরীব ও দুঃখী মানুষের প্রতি বিশেষ ভাবনা প্রদর্শন করতে হবে। সুতরাং মৌলিক অর্থনৈতিক নীতি হল এই যে, এই পৃথিবীর সকল সৃষ্ট বস্তু ঈশ্বরের এবং এগুলো মানুষ ও সকল জাতির কল্যাণে প্রদত্ত। আমরা এগুলোর তত্ত্বাবধানকারী মাত্র, যারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেগুলো এমনভাবে ব্যবহার করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত, যাতে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত হয়। সকলের কথা না ভেবে স্বার্থপরতার মত সম্পদের মজুদকরণ আর মুনাফা অর্জনের যে-কোন প্রচেষ্টাই ভুল। আর পোপ দ্বিতীয় জন পল 'লাগামহীন পুঁজিবাদ'-কে 'মন্দ' বলে অভিহিত করেছেন।

সমসাময়িক জগতে আমরা কিভাবে এ সকল মূল্যবোধ ও নীতিমালার ব্যাখ্যা দিই ? স্বাধীনতা বলতে দায়িত্বহীনতা বুঝায় না। অর্থনৈতিক সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে এবং উৎপাদন বাড়াতে হবে, যেন সকলে তাদের নিজ চাহিদাগুলো পর্যাপ্তভাবে মেটাতে পারে। আর এ জন্য, মুনাফার প্রেক্ষাপটে কিছু আর্থিক অনুদানকে বর্জন করে চলা যায় না। তবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান ভাবনা অবশ্যই হতে হবে সকল মানুষের চাহিদা পূরণ, শুধুমাত্র অল্প কয়েকজনের বিলাসিতা নয়। খাদ্য ও ঔষুধের ন্যায় মৌলিক চাহিদাসমূহের পর্যাপ্ত উৎপাদন এবং সহজপ্রাপ্তিতা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সকল সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে একটি কার্যকর বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। শ্রম-সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর আরও বৃদ্ধি ঘটাতে হবে, যাতে সবাই সমান কর্মসুযোগ ভোগ করতে পারে। সম্পদের অপরিমিত মজুদকরণ এবং মুনাফার পিছনে লাগামহীন ছোটা পরিহার করে চলতে হবে। স্টক মার্কেটগুলো, যেগুলি শ্রম ছাড়াই অর্থ দিয়ে অধিক অর্থ উৎপাদন করে, তার উপর কর আরোপ করতে হবে। উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিগুলো সামাজিকভাবে সকল পর্যায়ে, অর্থাৎ গ্রাম পর্যায় থেকে আরম্ভ করে জাতীয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত, নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। গরীব আর সুবিধাবঞ্চিতদের দেখাশোনা করার জন্য একটি নিরাপদ কাঠামোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও নীতি অবশ্যই সামাজিক কল্যাণের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ অমর্ত্য সেনের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর অর্থ হল এই যে, আমাদের হাতে তত্ত্ব রয়েছে। একমাত্র যে বিষয়টি প্রয়োজন, তা হল, উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়নের আর তত্ত্বকে বাস্তবে রূপদানের জন্য কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

অংশগ্রহণধর্মী গণতন্ত্র

রাজনীতিবিদ ও পুঁজিবাদীগণ একে-অপরের পৃষ্ঠপোষক। পুঁজিবাদীগণ নিজেদের রক্ষাকল্পে আর বাজারে নিজেদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাশীলদের বিভিন্নভাবে ঘুষ প্রদান করে থাকেন।

সর্বত্রই নিজেদের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ধনী দেশের রাজনীতিবিদগণও তাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেন। গরীব দেশগুলিতে, পুঁজিবাদীগণ আর তাদের রাজনৈতিক বন্ধুগণ একনায়কসুলভ সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেন, যে ব্যবস্থা তাদের গরীবদের শোষণের জন্য একটি 'শান্তিপূর্ণ' পরিবেশ সৃষ্টি করে। এমনকি তথাকথিত গণতন্ত্র ব্যবস্থায়, অর্থের জোরে আর/কিংবা গণমাধ্যমের প্রভাবে নির্বাচনে বিজয় নির্ধারণ হয়ে যায়। জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের স্বার্থে কাজ করার চেয়ে নিজেদের সমৃদ্ধি নিয়ে অনেক বেশী ব্যতিব্যস্ত। সংখ্যালঘুরা সর্বত্র শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে নয়, পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়েও নিষ্পেষিত। বীরপূজা কিংবা গণমাধ্যম সৃষ্ট ভাবমূর্তি অযোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষমতায় আনয়নে সহায়তা করে। সামন্তপ্রথা, যে ব্যবস্থায় শিল্পপতি আর রাজনৈতিক হোমরা-চোমরাগণ জমিদারের স্থান দখল করেন, গণতন্ত্রের মুখোশ ধারণ করে। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধনী দেশগুলোর স্বার্থের সেবায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, নিয়োজিত। কর্তৃত্ববাদী সরকারগণ বৈধ আর অবৈধ দমনমূলক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে গরীব লোকদের নিষ্পেষিত করছে। সংকটময় পরিস্থিতিতে, অবশিষ্ট বিশ্বকে সুপার-শক্তি আর এর মৈত্রী দেশগুলো তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় হুমকি-ধামকি প্রদান করতে কিংবা মিলিটারী শক্তি প্রয়োগ করতে গড়িমসি করে না। আজকে, অস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রি একটি অত্যন্ত লাভজনক শিল্প।

এ রকম ক্ষমতা লালায়িত পৃথিবীতে, ক্ষমতা ধরে রাখা ও প্রয়োগের কোন বিকল্প উপায়ের আমরা কি প্রস্তাব করতে পারি ? সকল ধর্মই স্বীকার করে যে, ঈশ্বরই একমাত্র এই পৃথিবীর শাসক এবং মানুষের ক্ষমতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে ও তাঁর প্রতি দায়বদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন এবং নিজের প্রতি দায়িত্বশীল আর একমাত্র ঈশ্বরের নিকট তার জবাবদিহিতা রয়েছে।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, একটি আদর্শ সমাজ কেমন হতে পারে ? একজন একটি 'অংশগ্রহণধর্মী গণতন্ত্র' ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারে। এটা বর্তমানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত তা থেকে ভিন্ন ঃ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রগুলো লোকদের একটি ছোট দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, যারা কি-না জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আর পরে যারা সেই ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটায়। নির্বাচনগুলো প্রকৃত পরিবর্তন আনয়ন ছাড়াই প্রার্থীদের পরিবর্তন ঘটায়। তাছাড়া বিরাজমান ব্যবস্থা, সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের আধিপত্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করে। একটি অংশগ্রহণধর্মী গণতন্ত্র ব্যবস্থায়, তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত গণতান্ত্রিক নানা কাঠামো থাকবে। জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে অবিরাম মতের বিনিময় ঘটবে, যাতে করে জনগণ যে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে। এখানে ব্যবস্থা থাকবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ব্যাপক মত বিনিময় ও আলোচনা। এক্ষেত্রে জনগণকে অবশ্যই প্রথমে বিবেকী করে তুলে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে জাত বা শ্রেণীভিত্তিক দলীয় আনুগত্য প্রকৃত অংশগ্রহণকে নস্যাৎ না করে দিতে পারে। নির্বাচিত নেতৃবর্গ, যারা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্ষমতাসীন, জনগণের সাথে সব সময় ঘনিষ্ঠ যোগযোগ রক্ষা করে চলবেন আর জনগণের সেবক হিসেবে নিজেদের গণ্য করবেন।

এই দর্শনটি ও কি অতি ভাববাদধর্মী ? অনেক প্রধান দলগুলোর মধ্যে অনুরূপ অংশগ্রহণধর্মী কাঠামো গ্রাম ও জাতিগত পর্যায়ে বিরাজমান। সুইজারল্যাণ্ড নামের দেশটিতেও কমবেশী স্বশাসিত বিভিন্ন প্রদেশ রয়েছে, যেগুলো নিজেদের দ্বারাই পরিচালিত, তবে নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ন্যায় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে দায়িত্ব সমানভাবে সহভাগিতা করে। এ ধরনের একটি ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে সকল পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণকে এবং বিশ্বজনীনতার মুখে স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্ত শাসনকে সম্মান করার নির্দেশ করবে। এমনকি প্রচলিত গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলোর মধ্যে, জনগণের ইচ্ছার প্রতি আরও বেশী সাড়াদায়ী করে তোলার লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন সম্ভব। একজনের পক্ষে আরও সম্ভব সংসদীয় ব্যবস্থাকে জাতীয়, আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে এমনভাবে সংস্কার করা, যাতে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিচালনা বা আরোপন অপেক্ষা অবহিতকরণ ঐকমত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক নীতি হয়ে ওঠে। সর্বোপরি একটি সক্রিয় বিচার ব্যবস্থাই দুর্নীতিকে

নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কাজেই, রাজনীতির দলীয় ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনা করা দরকার। মূল বিষয় হচ্ছে, অধিকাংশ দেশে, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর আসঞ্জন জাতিসত্তা ও ধর্মের ন্যায় অন্যান্য বিষয় কর্তৃক নির্দিষ্ট নয়, সেই সকল দেশে বামপন্থী ও ডানপন্থী দলগুলোর মধ্যকার মৌলিক আদর্শগত পার্থক্যগুলো জোর বা গুরুত্বের পাথর্ক্যসমূহে রূপ নিচ্ছে। 'পঞ্চায়তি রাজ' একটা আকষর্ণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারত যদি এটাকে উপযুক্তভাবে পরিচালনা করা হত। বিভিন্ন ধরনের কর্তৃত্ববাদী সরকারের শাসন অভিজ্ঞতার পর, জনগণকে অংশগ্রহণধর্মী গণতন্ত্রের জন্য বিবেকী আর শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। আমাদেরকে আরও গড়ে তুলতে হবে উপযুক্ত যত কাঠামো। সারা বিশ্বের মানুষ অবাধ নির্বাচনে নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ভোটার হিসেবে প্রমাণ করছে। যদি সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তারা একটি প্রকৃত গণতন্ত্র, যে গণতন্ত্র প্রকৃতঅর্থে লোকদের জন্য আর লোকদের দ্বারা, সেই তার নাগরিক হিসেবে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের ঊর্ধ্বে উন্নীত হবে। তাদের অধিকারকে তারা যে সব নেতা নিজেদের স্বার্থ-সেবায় নিয়োজিত তাদের নিকট সঁপে দেবে না।

সম-অধিকারপূর্ণ একটি সমাজ

সফল অংশগ্রহণধর্মী গণতন্ত্রের অন্যতম অন্তরায় হলো জাতি, গোত্র, ধর্ম ইত্যাদির ন্যায় বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে অসংখ্য দলে বিভক্তি। বর্ণ প্রথাই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বিষ। তবে জাতি, গোত্র আর ধর্ম ইত্যাদিও সর্বত্র সমাজকে বিভক্ত করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ঝাঁকে ঝাঁকে অভিবাসনের দরুণ, কোন সমাজই আজকে বিভক্তি আর বৈষম্য থেকে দায়মুক্ত নয়। একজন 'পীড়াধর্মী' কথাবার্তা পরিহার করে বিনয়ের সাথে বহুসংস্কৃতিবাদ সম্পর্কে বলতে পারে বটে। তবে, সামাজিক বাস্তবতা সেই একই। সাম্প্রদায়িকতা এমন একটি বাস্তবতা যা এটাকে সত্য বলে ধরে নেয় যে, যারা একটি নির্দিষ্ট ধর্ম, জাত বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, তারা সকলে সমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ভোগ করবে। যখন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চালায়, তখন এই ধারণা একেবারে অমূলক নয়।

এ কথা সত্য যে, জাতিগত বা ধর্মীয় পার্থক্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এমনকি জাতিগুলোও, তাদের শ্রেণীবিন্যাসগত কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে খুইয়ে, জ্ঞাতি বা কৃষ্টিগত দল হিসেবে অবস্থান করতে পারে। তবে যা এই সমস্যা সৃষ্টি করছে তা হলো, এই বিষয়গুলো বৈষম্য আর বিরোধিতার কারণ হয়ে ওঠে। নারীবাদীগণ দেখিয়েছেন কিভাবে লিঙ্গ বৈষম্য সামাজিক বৈষম্যের কারণ হয়। এমন বিরোধিতার অনেক সময় রয়েছে ঐতিহাসিক নানা ভিত্তি। অতীত দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানুষের মধ্যে বিভক্তি বাড়িয়ে তোলা অব্যাহত রাখে, যেমন করে নিরাময়হীন স্মৃতি বদ্ধ-ধারণার কারণ হয় আর ক্রোধ জাগিয়ে তোলে।

এ রকম নানা সামাজিক বিভক্তি ও বৈষম্যের বিপরীতে, এক নতুন সমাজের দর্শন সকল মানুষের মাঝে সমতার কথা ঘোষণা করবে। প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, আর সে মর্যাদার অধিকারী, অভিন্ন মানুষ হিসেবে সে অন্যদের সাথে যা সহভাগিতা করে শুধুমাত্র তার কারণে নয়, কিন্তু যা তাকে অন্যের থেকে আলাদা করে সেই কারণেও, তা এই আলাদা বিষয়টা ঈশ্বরের একটি দানও হতে পারে বা তার নিজ অর্জিত বিষয়ও হতে পারে।

আমাদের সমসাময়িক সমাজে, কোন বৈষম্য ছাড়াই বিভিন্নতায় একতার দর্শনকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? একটি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবণতা হল, লোকদের নিছক অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা এবং সাংস্কৃতিক ও জাতিগত দলগুলোর অধিকারকে শ্রদ্ধা না করা। তবে বহুসংস্কৃতিবাদকে ঘিরে সমসাময়িক অনেক আলোচনা, সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এ সকল দলগুলোর জন্য স্বশাসনের প্রয়োজনীয়তাকে ইঙ্গিত করে। ভারতের মত অনেক দেশের সংবিধানে ধর্ম, ভাষাগত ও কৃষ্টিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো, সামাজিক চেতনার বিস্তার ঘটানো, যা আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দলীয় পরিচিতিকে ছাড়িয়ে যাবে। বিভিন্ন দেশ এখন অর্থনৈতিক কারণে ঐকমত্যে আসছে। এর একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিউনিটি। অবশ্য এই পর্যায়ে দলীয় পরিচিতির মত বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে অত্যাবশকীয় হলো, জীবনভিত্তিক সংলাপকে এগিয়ে নেওয়া, যেখানে অন্যের ভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়ে শ্রদ্ধা করা হয় এবং একই সময়ে সমাজের উচ্চ নীতির প্রেক্ষাপটে একটি সম্পর্ক সমর্থন করা হয়। জনগণ যানবাহনে, বিদ্যালয়ে, বাজারে একে-অন্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদান ঘটায়। তারা সহায়তা পেতে পারে সুনির্দিষ্ট পরিচিতিসহ একে-অপরকে জানতে আর পার্থক্যকে সম্ভ্রম করতে, যাতে কুসংস্কার ও শত্রুভাবাপন্নতা দূরীভূত হয়। বিদ্যালয়ই হতে পারে সেই স্থান, যেখানে এ ধরনের পারস্পরিক আবিষ্কারকে এগিয়ে নেওয়া হয়, বিশেষ করে কিছু সাধারণ ক্রিয়াকলাপে সহযোগিতার প্রেক্ষাপটে। সত্যিকার সংঘাতের সময় বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে, যা সুযোগ সৃষ্টি করবে সত্যিকার দুঃখ-দুর্দশা যা কয়েকটি বিশেষ দল ভোগ করতে পারে সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন করে তোলার জন্য, কেননা এগুলোকে প্রায়শ: উপেক্ষা করা কিংবা অনান্য সময়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

স্বাধীন ব্যক্তিবর্গ

সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতি খুব বেশী ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তবে ব্যক্তিকে শুধুমাত্র শ্রমিক ও উৎপাদক হিসেবে তার দক্ষতার জন্য মূল্যায়ন করা হয়। অনেকের নিকট, শ্রম স্বয়ং হস্ত থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে মস্তিষ্কে। সে এখন নৈর্ব্যক্তিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর দাসত্বে পরিণত হয়েছে। এগুলোর কাছে সে নিজেকে অসহায় মনে করে। এ কারণে তাকে হয় খাপ খাইয়ে নিয়ে মানিয়ে চলতে হয় কিংবা দলিত হতে হয়। তাই সে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন নয়। একদিকে যখন একজনের বিচারক্ষমতার অতিবিকাশ ঘটে, তখন অন্যদিকে তার আবেগ-অনুভূতির আদৌ বিকাশ ঘটে না এবং অনেক ক্ষেত্রে নিগৃহীত হয়। খুব বেশী হলে, একজন নিজের মধ্যে এগুলি সীমাবদ্ধ রাখতে পারে। দেহের পুষ্টিবিধান ও বস্তু চাহিদা মেটানো হয়, কিন্তু আত্মা বা মনের চাহিদাকে অবহেলা করা হয়। জীবনে টিকে থাকা এবং সফলকাম হওয়ার একটা প্রচন্ড প্রতিযোগিতা প্রতিনিয়ত চলছে। অপর হচ্ছে শত্রু। এ ধরনের পরিস্থিতিতে, অহমবাদ একটি সদ্‌গুণে পরিণত হয়। লোকেরা তার ব্যক্তি অধিকার দাবী করলেও, অন্যদের প্রতি তাদের কর্তব্যকে মূলতঃ ভুলে যাওয়া হয়। 'হওয়া' অপেক্ষা 'থাকা' (অনেক অনেক বেশী) জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এমনকি আত্মাকেন্দ্রিক ভালবাসাও বাসনা হয়ে ওঠে। ব্যক্তিত্ব বিকাশধর্মী কার্যক্রম আত্মতুষ্টিমূলক অনুভূতি লাভে সাহায্য করে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করে। ধ্যান-কৌশল নৈতিক দায়-দায়িত্ব পালন ছাড়াই মনের শান্তি বৃদ্ধিকল্পে ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিঃসন্দেহে স্বাধীন। তবে সে সর্বদা অন্যের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। ভালবাসা এবং সহমর্মিতা অবশ্যই তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করে। ব্যক্তির এমন দর্শন আমাদেরকে চালিত করে একটি আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলার দিকে, যে আধ্যাত্মিকতা একই সময়ে মুক্তিমূলক এবং সমন্বয়ধর্মী, আর প্রতিনিয়ত সমগ্র বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কের পূর্ণতার দিকে ধাবিত। একজন ব্যক্তি আত্ম-সংযমের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম। একজন ব্যক্তি স্বাধীন হয় এগুলোর মাধ্যমে ঃ নিজ বাসনাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে, অবধারণ ও বাছাই করতে শিক্ষার মাধ্যমে, চলমান খেয়ালিপনা অনুসরণ না করার মাধ্যমে। একই সময়ে, প্রতীকী ক্রিয়ার মাধ্যমে একজন জগতের সঙ্গে, অন্যদের সঙ্গে আর ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে নিজ দেহ, আবেগ আর মনকে সমন্বয়ের চেষ্টা করে। এ ধরনের সমন্বয় একজন জগত থেকে প্রত্যাহারের মাধ্যমে নয়, কিন্তু জগতের মধ্যে সৃজনশীলভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে, কেননা একজনের নিজ পূর্ণতা নির্ভর করে সকলের পূর্ণতার উপর। একজন ব্যক্তি নিজ পূর্ণতা খুঁজে পায় অন্যদের জন্য একজন হয়ে ওঠার মাধ্যমে। এই ধরনের উদারতা সেবাকাজে প্রকাশ পায়। স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি সমাজ গঠনরূপ লাভ করে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে। এভাবে জীবন পরস্পরের কাছে একটি উপহার হয়ে ওঠে। এরই মাধ্যমে একজন গতানুগতিক হওয়া থেকে মুক্ত হতে পারে।

প্রতি-সংস্কৃতি

সাম্প্রতিক সময়কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যেভাবে

বুঝা ও ব্যবহার করা, সে দিক থেকে বলা যায়, আধুনিক সংস্কৃতির শিকড় এগুলির মধ্যে নিহিত। বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ আর পরিমাপযোগ্য নয় এমন সবকিছুকে বিবেচনা থেকে শ্রেণীভুক্ত করে। সে সমস্ত কারণের ক্ষেত্রে এর কোন কার্যকারিতা নেই যেগুলি বাস্তবে অভ্যন্তরীণ নয়। সুতরাং, যদি অস্বীকার করা না হয়, তবে সকল অতিলৌকিকতাকে উপেক্ষা করা এবং অবান্তর বিবেচনা করা হয়। মানুষ নিজেকে আত্মনির্ভরশীল বলে দাবি করে। বিচার-শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদে পরিণত করা হয়, যখন একে মানব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত নিয়ন্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আর উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নিয়মগুলোকে কাজে খাটায়। এ প্রযুক্তির রয়েছে প্রকৃতির প্রতি শোষণধর্মী প্রবণতা। এমনকি মানুষও এর অনধিকারপ্রবেশ থেকে নিরাপদ নয়, অন্ততঃপক্ষে সমসাময়িক বিভিন্ন জীব-প্রযুক্তিবিদ্যা যেমনটি প্রমাণ করে। প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারও বস্তুর উপর ক্ষমতার আধিপত্যের মনোভাব সৃষ্টি করে। মানুষ মনে করে, তারা সব সমস্যার সমাধান করতে এবং সকল লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে, যদি উপযুক্ত প্রযুক্তিসমূহের বিকাশের জন্য তাদের যথেষ্ট সময় ও সম্পদ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রশংসাযোগ্য উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব, যেমন খাদ্য উৎপাদন ও রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বৈষয়িকীকরণ ও উপাস্যবস্তুতে পরিণত করা হলে, এগুলি বস্তুবাদ ও জগতসর্বস্ববাদপূর্ণ মনোভাবের জন্ম দেয়। মানুষকে দেহে আর এর অতি ভোগবাদী চাহিদায় নামিয়ে আনা হয়। সে হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি চক্রের ক্রীড়াবস্তু। প্রকৃতিকে অবমাননা ও ধ্বংস করা হয়। প্রকৃতির প্রতি মানুষের মনোভাব নারীর প্রতি তাদের মনোভাবের সঙ্গে হাতে হাত রেখে চলে। নারী যৌন উপাদান হিসেবে ব্যহৃত হয় এবং তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। এই সকল বিষয়গুলো বিস্তার ঘটাচ্ছে আত্মবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের একটি সংস্কৃতি। এ সকল প্রভাবশীল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে গণমাধ্যম বিজ্ঞানের মাধ্যমে আর নানা চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আজকে মানুষ আধুনিকতা-পরবর্তী যুগ সম্পর্কে বলে। বিংশ শতাব্দীর দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পর এবং সর্বত্রই চলমান সহিংসতার প্রেক্ষাপটে, যুক্তি নিজেই একটি উপযুক্ত সহায়ক হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কার্ল মার্ক্স, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মিচেল ফোকাল্ট এবং জ্যাক্স ডেরিডার মত ঈশ্বর-অবিশ্বাসীগণ দেখিয়েছেন যে, জগত সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞান নিছক যুক্তি-বুদ্ধির কাজ নয়, কিন্তু এটা সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর এ কাঠামোগুলি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে, আমাদের সচেতন ও অবচেতন অনুভূতিগুলোকে যা আমাদের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে, আর ভাষার ন্যায় প্রতীকী কাঠামোগুলোকে – যেগুলি আমাদের জ্ঞানকে আর একটি বিশেষ কাঠামোয় এর যোগাযোগকে বিন্যস্ত করে – গঠনরূপ দান করে। এই সকল বিষয়গুলো বহুত্ববাদেরও উৎস বটে। এই বহুত্ববাদ একটি আপেক্ষিকধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে, যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমরা কোন বিষয়ে নিশ্চিত নই। অপরদিকে, এটা এমন একটা মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে, যা স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণকালে, অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন থাকে। এটা অনুপ্রাণিত করতে পারে এক ধরনের সহিষ্ণুতাকে আর সেই সাথে পূর্বধারণা ও পূর্বসংস্কারসমূহ যাচাই করে দেখার জন্য আমাদের তাগিদ দিতে পারে। এটা আমাদের সঠিক কর্মের জন্য মানদণ্ডের অন্বেষণে সাহায্য করে, এমনকি যখন আমাদের নিশ্চিত জ্ঞানগুলো নিশ্চিত বা চূড়ান্ত নয়। আমরা প্রতি মূহূর্তে সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য বিকল্প পন্থা নির্ণয় করতে শিখি।

বিষয়বস্তু আর অহমকে কেন্দ্র ক'রে সংস্কৃতির জন্য আমরা অবশ্য বিরোধিতা করব একটি প্রতি-সংস্কৃতির, যে সংস্কৃতি ঈশ্বর ও অন্যদেরকে কেন্দ্র করে। তবে এখানে ঈশ্বরকে একটি অপর-জাগতিক বাস্তবতা হিসেবে দেখা হয় না, যে বাস্তবতা এ জগত থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে। যাতে আমরা সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের মধ্যে সবকিছুকে দেখতে চালিত হই সেই জন্য এই জগতের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক হিসেবে ঈশ্বর এই জগতেই উপস্থিত। এই জগত, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বশাসনকে অস্বীকার করা হয় না, কিন্তু একে মানুষ ও সামাজিক নানা ভাবনার অধীন করা হয়েছে। এই

বিশ্ব ব্যবস্থায়, মানুষের সাথে মানুষের ও মানুষের সাথে জগতের সম্পর্ক আধিপত্য, শোষণ, ও অরাজকতা দ্বারা নয় কিন্তু সংলাপ, দান ও সেবা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

বর্তমান পৃথিবীতে, বস্তুবাদী ও জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো উত্তরোত্তরভাবে পরিত্যাগ করা হচ্ছে। স্বর্গীয় আর অতি-প্রাকৃত বিষয়ে আগ্রহ ক্রমশ: বেড়ে চলছে। পরিবেশ ও নারীবাদী আন্দোলনগুলো নারী ও প্রকৃতির প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ দাবী করছে। মানুষ যথাযথ প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রস্তাব করে যে, প্রবৃদ্ধির সীমারেখা রয়েছে। শান্তির জন্য নব অন্বেষণ সংলাপ ও সহযোগিতার প্রতি জোর দেয়। প্রকৃতির অতি সন্নিকট আর জনসমাজের নিকট অনেক বেশী সংবেদী অপ্রধান সংস্কৃতিগুলো কর্তৃত্বময় ও শোষণকারী সংস্কৃতিগুলোকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। কাজেই আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে এ সকল প্রতি-সংস্কৃতির শক্তির সাথে মিলিত হয়ে সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রাম করে যাওয়ার ।

প্রাবক্তিক ধর্ম

প্রত্যেক ধর্মেই মৌলবাদী দলগুলো একটি অপ্রাসঙ্গিক ও বিচ্ছিন্ন ধর্মের বিস্তার ঘটায়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অনুরূপতা ও ধর্মানুষ্ঠানবিধি চাপিয়ে দেওয়া আর, যদি হত্যা না করা হয়, তাহলে বিভিন্ন আত্মিক অনুগ্রহ ও প্রাবক্তিক কর্মকাণ্ডকে দমন অব্যাহত রাখে। সাম্প্রদায়িকতা চেষ্টা করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে ধর্মের শক্তিকে ব্যবহার করতে। অন্যদিকে সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলো ধর্মকে ব্যক্তিকরণের চেষ্টা চলায়। ধর্মগুলো নিজেও বিদ্যমান কাঠামোগুলোকে ন্যায়সঙ্গত করার দিকে ঝোঁকে। এই প্রেক্ষিতে, জনগণও চেষ্টা করে ধর্মহীন নিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এবং একটি বিশ্বজনীন নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন যুক্তিযুক্ত ভিত্তির অন্বেষণের মাধ্যমে ধর্মগুলোর বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার।

ধর্মগুলো শুধুমাত্র সিদ্ধই নয় পাশাপাশি প্রাবক্তিকও। এগুলো জীবন ও বাস্তবতাকে অসীম সত্তার প্রেক্ষাপটে অর্থপূর্ণ হিসেবে দেখে। এই অসীম সত্তার নামে এগুলো রূপান্তরের জন্য জীবন ও বাস্তবতাকে উদাত্ত আহ্বান জানায়। মহর্ষিগণ ও প্রবক্তাগণ মাঝে-মধ্যে মানুষকে পরিবর্তনের আহ্বান জানান। ধর্মশাস্ত্র, সংস্কার ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এমন এক সম্ভাব্য নতুন পৃথিবীর আহ্বান জানায় যা মানুষকে মন পরিবর্তনের প্রতি আহ্বান জানাতে পারবে। কিন্তু বাসনা ও ক্ষমতার ন্যায় অহংবোধ ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কারসমূহকে দুর্বল করে দিতে আর অপব্যাখ্যা করতে পারে। ধর্মের বৈধ আর প্রাবক্তিক দিকগুলো সর্বদাই টানাপোড়েনের মধ্যে থাকে।

এক নতুন সমাজ ব্যবস্থাকে ঘিরে এই দর্শন ধর্মের একটি দ্বিমুখী সংস্কার দাবী করে। প্রতিটি ধর্মকে অবশ্যই প্রাবক্তিক কণ্ঠস্বর ও আন্দোলনের প্রতি উন্মুক্ত হতে হবে, যাতে একটি সংস্কার ও নবায়ন প্রক্রিয়া সম্ভব হয়। কোন যুগেই প্রবক্তার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তাদের আহ্বান শোনা হয় না এবং প্রায়শঃ তাদেরকে হত্যা করা হয়। আজকে ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ অন্য সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্য থেকেও আসতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার সংস্কারের দাবি হল, যেন প্রতিটি ধর্ম তার বাহ্যিক আড়ম্বরতা ঝেড়ে ফেলে আর নিরপেক্ষ জীবন ও সমাজের একটি অভিন্ন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির ব্যবস্থা করার সম্মিলিত দায়িত্বে অপরাপর ধর্মগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতে শেখে। এটা একমাত্র পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমেই করা সম্ভব।

উপসংহার

সুতরাং, এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনটা চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ। অনেক বাধা-বিপত্তি আমাদের স্বাধীনতা ও একত্বে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তবে পাশাপাশি, আমাদের সাহায্যের জন্যও রয়েছে অনেক সুযোগ-সুবিধা। পৃথিবীটা আমাদেরকে দাসত্বে পরিণত করবে না, যদি না আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিই এবং আবেগ ও ক্ষমতার দাসে পরিণত হই। যে জগতে আমরা বসবাস করতে চাই তা আমরা গড়ে তুলতে পারি। এখন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করাটা আমাদের উপরই নির্ভর করে।

২

বিশ্বজনীন নানা দর্শন

এর আগে আমাদের এই জগত বা পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এর সমস্যাগুলোকে জেনেছি, তবে সেই সাথে এর সম্ভাবনাসমূহকেও। এই পৃথিবীর রূপান্তরের প্রয়োজন। ধর্ম ও মতবাদগুলো শুধুমাত্র পৃথিবীটা এখন যেমন সে-রূপেই এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কিন্তু সেই সাথে এটা কি হয়ে উঠতে পারে তা-ও কল্পনা করে। বর্তমানে অবিচল থেকে, এগুলো ভবিষ্যৎকে কল্পনায় দেখতে আমাদের সাহায্য করে। এগুলোর দর্শন আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ঐতিহ্যগতভাবে, চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো, যেগুলো এ ধরনের একটি দর্শনের যোগান দিয়েছে, ধর্মই এগুলো নিয়ে কারবার করেছে। সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে, মতবাদগুলোও এ ধরনের একটি দর্শন যোগানোর দাবি করে। উদাহরণ হিসেবে, কার্ল মার্ক্সের 'শ্রেণীহীন সমাজ' এ ধরনের একটি আদর্শগত, অংশতঃ ধর্মীয় দর্শন।

এখানে এ সকল দর্শনের কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এগুলোর প্রবণতা হল বিশ্বজনীন হওয়ার, কেননা এগুলো হল, একটি চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসের পরিণাম। ধর্মগুলো উৎস আর/অথবা ইতিহাসের লক্ষ্য হিসেবে এক পরম সত্তায় বিশ্বাস করে। এগুলোর রয়েছে একটি সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি যা সমগ্র ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। মতবাদগুলো বিশ্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে জগতকে অবলোকন করে, যদিও এগুলোর ব্যাখ্যামূলক নীতিগুলো অ-ধর্মীয়, যেমন প্রকৃতি ও সমাজ। একদিকে হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টানধর্মের ন্যায় ধর্মগুলো যেমন একটি আস্তিকতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্ক্সবাদের ন্যায় মতবাদগুলো একটি নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তখন কনফুসীয় ও বৌদ্ধধর্মের ন্যায় ধর্মগুলো বাস্তবতা বিষয়ক একটি আস্তিকতামূলকহীন দৃষ্টিভঙ্গি সহযোগে মধ্যপথ পোষণ করে বলে মনে হয়। এখানে আমরা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এ সকল বিভিন্ন ধর্মীয় ও মতবাদগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব।

বিশ্বজনীন ধর্মসমূহ ঃ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিতে

বিশ্বজনীন ধর্মসমূহ, হোক তা উপজাতীয় কিংবা লৌকিক, প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যে অবস্থানের চেষ্টা করে। এ সকল ধর্ম অপর একটি পারমার্থিক জগতের উপর আলোকপাত করে না। এগুলো জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তে পদার্পণ, বিবাহ ও মৃত্যুর ন্যায় জীবনচক্রভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠানকে ঘিরে আবর্তিত হয়। এ সকল ধর্মের অনুষ্ঠানগুলো অনুসরণ করে চলে বিভিন্ন ঋতু, যেমন বসন্ত, শরৎ, বর্ষা ও হেমন্ত। এগুলো টানাপোড়েন এবং মানসিক কিংবা শারীরিক অসুস্থতা থেকে আরোগ্য কামনা করে। এগুলো পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করে না। এগুলোর নেই কোন যাজকশ্রেণী। সমাজ একত্রে বসবাস ও পূজার্চনা করে। সংকটকালে, নেতৃবর্গ একত্রিত হয়ে এমন একটা ঐকমত্য খোঁজার চেষ্টা করে যা একটি অভিন্ন অঙ্গীকার ও কাজের দিকে চালিত করবে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ও প্রতিযোগিতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। সমাজ সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখে। লোকেরা যেমন সম্পদ মজুদ করে না, তেমনি অন্যের ক্ষতিও করে না। সুখই হচ্ছে এই জীবনে তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

হিন্দুধর্ম ঃ যার কোন দ্বিতীয় নেই

হিন্দুধর্মের সূচনা অসংখ্য দেব-দেবী দিয়ে, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকৃতির ঐশ্বরিক শক্তি, যেমন সূর্য, বাতাস, অগ্নি আর জল। গভীর ধ্যান সকল সত্তার একত্বকে উপলব্ধি করার দিকে চালিত করে। ব্রহ্মকে দেখা হয় জগতপতি হিসেবে। আত্মা হচ্ছে ব্যক্তির অন্তর সত্তা। ব্রহ্ম ও আত্মা দ্বিত্ব নয়। এটাই হল অদ্বিত্বের মূল নীতি।

এ বিষয়টি চালিত করে একটি সার্বজনীন দর্শনরে দিকে। ইছা উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ "দেখ সমগ্র জগত ভগবানের গৌরবে উচ্ছলিত এবং তাঁহাতেই সকলে জীবিত ও আবর্তিত। ক্ষণস্থায়ী বস্তু ত্যাগ করে অনন্ত জীবনের আনন্দ অন্বেষণ কর : অন্যের সম্পদের প্রতি তোমার হৃদয়কে প্ররোচিত করো না ... যে ব্যক্তি সকল জীবনকে নিজের আত্মার মধ্যে এবং নিজের আত্মা সকল জীবের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে সেই পারে সকল সংশয় জয় করতে। যখন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই মহৎ একতাকে উপলব্ধি করে এবং তার সত্তা সকল জীব সত্তায় পরিণত হয়, তখন কোন বিভ্রান্তি ও দুঃখ কি তার সঙ্গে থাকতে পারে ?"

তাহলে, পরম আত্মা বা সত্তার সঙ্গে একাত্ম হওয়াই হয়ে ওঠে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পরমাত্মার মাধ্যমে একজন সমগ্র জগতের সাথে এক হতে পারে। এই সার্বজনীন মিলন সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে ভগবদ্ গীতায়, যখন এটা অর্জুনের (অন্বেষণকারী) কৃষ্ণ (মানুষের বেশে ভগবান) দর্শনের কথা বর্ণনা করে ঃ সকল দেব-দেবীদের দেবতার (ভগবান) মধ্যে তখন পাণ্ডব পুত্র (অর্জুনের পিতা) সমগ্র পৃথিবী দেখতে পেলেন, যা অনেকভাবে বিভক্ত, আর সকলই সংযুক্ত।

দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুরা বর্ণ প্রথার ভিত্তিতে এ জগতকে পদমর্যাদানুক্রমে শ্রেণীভেদ হিসেবে দেখে থাকে। এই কাঠামোটির রূপদান করা হয়েছে উপাসনিক বা আনুষ্ঠানিক পবিত্র ও অপবিত্রতার ভিত্তিতে। কর্ম বিধান অনুসারে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পূর্বকর্মের ভাল বা মন্দ ফলপ্রাপ্ত হয়। তবে সমাজের কাঠামো এই জগতে আর এখনকারই জন্য, ভবিষ্যতের জন্য তাদের দর্শনের অংশ নয়। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে একটি মিলনসমাজ, যেখানে সকলেই এক হবে, শ্রেণীহীন জনসমাজে, এমনকি অনেকবার জন্মগ্রহণ করতে হলেও। এটা নিঃসন্দেহে জাগতিক স্বর্গ বা কল্পরাজ্য নয়, কিন্তু একটি পূর্ণতা যা ইতিহাসের মধ্যে আর এর ঊর্ধ্বে নিহিত।

আমরা এ সমাজকে একটি অন্তর্দিকমুখী, অন্য জাগতিক কল্পরাজ্য হিসেবে বিবেচনা করতে প্রলোভিত হতে পারি। কিন্তু স্বামী অগ্নিবেশ, একজন সমসাময়িক সমাজকর্মী যিনি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, তাঁর মতে, বাইরের অসত্য শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুগ্মভাবে সংগ্রাম করা ছাড়া ভিতর থেকে সত্য অর্জন অকল্পনীয়। কাজেই, মিথ্যা ও দাসত্বের বিরুদ্ধে আর সহিংসতা ও লোভ এবং জবরদখলের উপর ভিত্তি করে অন্যায্য সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম একজনের আধ্যাত্মিক সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

ইচ্ছা উপনিষদে অনুপ্রাণিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, তাঁর জীবনের লক্ষ্য হল সত্য বা পরমাত্মাকে জানা, যদিও তিনি এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন যে, এটা একমাত্র ধারাবাহিক আংশিক নানা উপলব্ধির মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু এটা হচ্ছে ভালবাসা ও সেবার একটি নৈতিক পন্থা। তিনি তাঁর কল্পরাজ্য বর্ণনা করেছেন এই বলে ঃ আমি এমন এক ভারতের জন্য কাজ করে যাব, যেখানে একেবারে দীনহীনরা অনুভব করবে, এটা তাদের দেশ, এর গঠনে তাদের একটি কার্যকর কণ্ঠ আছে; এমন এক ভারতের জন্য যেখানে মানুষের মধ্যে উঁচু-নীচু শ্রেণীভেদ থাকবে না, যেখানে সব মানুষ প্রকৃত মিলন-বন্ধনে বসবাস করবে, যেখানে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বা মাতলামি ও নেশার অভিশাপের স্থান থাকবে না। নারীরা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে। যেহেতু আমরা জগতে সকলের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চাই, তাই কেউ শোষণ বা শাসিত হবে না ...এটাই আমার স্বপ্নের ভারত।

এই ঐতিহাসিক কল্পরাজ্য অর্থ পরম সত্য, যিনি পরম সত্তা, তাঁর সাথে চূড়ান্ত মিলন নয়। কিন্তু এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ধ্যান-সাধনা। এই দর্শনে হিন্দু প্রভাব থাকলেও, গান্ধীর আদর্শ পৌঁছে গিয়েছিল সমগ্র জগতে, কেননা তিনি সকল মানুষের, বিশেষ করে গরীব-দুঃখীদের মাঝে ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির, "আমি বিশ্বাস করি জগতে একটি মাত্রই ধর্ম আছে; আমি এ-ও বিশ্বাস করি যে, যদিও এটা একটা বিশাল বৃক্ষ, তথাপি এর রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা ... আর এমনকি যেমন করে সকল শাখা-প্রশাখা একই উৎস থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে, তেমনি সকল ধর্মও একই উৎস-ধারা (ভগবান) থেকে তাদের সত্তা আহরণ করে।

কিন্তু হিন্দুধর্মের এই সার্বজনীন, সর্বব্যাপী ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য অনুসারে গান্ধী এবং আরও অনেক হিন্দু জীবন

যাপন করেছেন, একে 'হিন্দুত্ব বা হিন্দুয়ানী' এর ন্যায় সমসাময়িক ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তিগুলো অস্বীকার করছে, আর এ 'হিন্দুত্ব বা হিন্দুয়ানী' যে শুধুমাত্র অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে তা নয়, পাশাপাশি হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রসার ঘটাচ্ছে ব্রাহ্মণদের দ্বারা শ্রেণী পরপরম্পরাগত আধিপত্য। এই প্রেক্ষিতে স্মরণে এসে যাওয়া রামরাজ্য (ভগবানের অন্যতম অবতার) হচ্ছে সহস্রাব্দিক দর্শন, যা এর শক্রমুক্ত বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে।

বৌদ্ধধর্ম ঃ আন্তর সত্তা আর সমাজবাদ

বৌদ্ধধর্মকে অনেক সময় ব্যক্তিতান্ত্রিক ধর্ম মনে করা হয়, আর মনে করা হয় এটা বৌদ্ধ ভিক্ষু কেন্দ্রিক যিনি তার নিজ নির্বাণ অন্বেষণ করছেন। বৌদ্ধধর্মের চার মহান সত্য হল কষ্টভোগের বাস্তবতা, এই কষ্টের কারণ কামনা-বাসনা, এবং এই কামনা-বাসনা জয়ের আটটি মার্গ যা গঠিত সঠিক জ্ঞান, কর্ম ও মনোযোগ নিয়ে। তবে, থাইল্যাণ্ডের ভিক্ষু বুদ্ধদাস ও ভিয়েতনামের Thich Nhat Hanh এর ন্যায় আধুনিক ব্যাখ্যাবিদগণ ভগবান বুদ্ধের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি আলাদা সমাজতান্ত্রিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হল 'অহমকে' অস্বীকার। কিন্তু একজন এমন যুক্তির অবতারণা করতে পারেন যে, মূলত: যা অস্বীকার করা হয় তা অহম নয়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী কর্মের উৎস হিসেবে অহম বা আমিকেই অস্বীকার করা হয়। অহম সব সময় সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ। এই ধারণার উপর ধ্যান করে বুদ্ধদাস পরবর্তীতে স্বীকার করবেন যে, বাস্তবতা নিজেই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক। অন্যদিকে Thich Nhat Hanh জোর দিয়েছেন আন্তর সত্তার উপর। এই জগতে থাকার অর্থ 'হওয়া' অর্থাৎ আন্তর সত্তা হয়ে উঠা। সত্তার এই ধারণার বাইরে আর কোন বাস্তবতা নেই।

Donald Swearer বুদ্ধদাসের শিক্ষার সারমর্ম করেছেন এইভাবে ঃ ব্যক্তি সত্তা নয়। কেননা সে চূড়ান্ত আত্ম-প্রকৃতি শূন্য একটি চলমান, নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ারই অংশ। এই প্রক্রিয়া কাজ করে সার্বজনীন নীতিমালা অনুসারে যাকে আমরা বলি প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হচ্ছে বস্তুজগতের সত্যিকার, আদর্শগত ও নৈতিক অবস্থা। কাজেই একজন সত্তাহীন হওয়ার অর্থ সত্তাশূন্য হওয়া।

এই ধরনের দর্শন অবশ্যই সার্বজনীন ও সর্বব্যাপক। এটা সমাজতান্ত্রিক। বুদ্ধদাস বলেছেন, আমরা যদি বৌদ্ধধর্মে অটল থাকি, তাহলে আমরা আমাদের স্বীয় সত্ত্বার মধ্যে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার অধিকারী হব। আমরা আমাদের চারপাশের মানুষকে দেখব এমন বন্ধু হিসেবে যারা কষ্টের মধ্যে রয়েছে – জন্মের সময়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায় ও মৃত্যুকালে – আর তাই আমরা তাদের পরিত্যাগ করতে পারি না। সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান এগুলোর উপর নির্ভরশীল ঃ সমাজে নৈতিক জীবনযাপন, প্রকৃতির বিধান অনুসারে জীবন যাপনের মাধ্যমে। সমগ্র সমাজের মহৎ স্বার্থে কাজ করা, আমাদের সাদামাটা চাহিদার বাইরে পণ্যের ভোগপরায়ণতা থেকে বিরত থাকা, আমাদের দরকার নেই এমন সবকিছু অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করা, এমনকি নিজেদেরকে গরীব বলে মনে হলেও।

বৌদ্ধ ধর্মের মহায়ানা ঐতিহ্যের রয়েছে বোধিসত্বের আদর্শ, যিনি জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হওয়ার পরও অন্য দুঃখী মানুষকে সাহায্য করার জন্য এই জগতে থেকে যেতে বিলম্ব করেন। ঐতিহ্যগতভাবে, বোধিসত্ত্বের চতুর্ভূজ শপথের কথা বলা হয়। এগুলির মধ্যে প্রথমটি হল ঃ জীবসত্তা; এদেরকে রক্ষার শপথ আমি করছি। এটা নিঃসন্দেহে একটি সার্বজনীন দর্শন।

ভারতে এ ধর্মের উদ্ভব ঘটলেও, বৌদ্ধধর্ম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রসারলাভ করেছে, আর তা সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে এমনকি বিভিন্ন ধর্মের সাথে সহজে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে। এই অর্থে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলো – যেগুলো একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে বাঁধা, নিজেদেরকে বিশ্বজনীন বলে দাবি করে – এগুলোর চেয়ে এটা 'প্রকৃত বিশ্বায়নের' প্রতি অনেক বেশী উদার।

কনফুসীয় ধর্ম ঃ সমন্বয়পূর্ণ প্রকৃতি

কনফুসীয় ঐতিহ্যে আমরা দেখি যে, 'স্বর্গ' বলে পরিচিত সর্বোত্তম ঈশ্বর হচ্ছেন প্রকৃতি আর এর নিয়মের নিশ্চয়াত্মক। এই নিয়ম এই বিশ্বজগতকে পরিচালনা করছে। একে বলে পরম 'তাও' বা পরম 'পথ'। এই নীতির আরও সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে তাওবাদ , যা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে একসাথে, চীন সংস্কৃতিতে ধর্মীয় দিকের যোগান দিচ্ছে।

আমরা এখানে লক্ষ্য করি একটি বিশ্বজনীন দর্শন ঃ "কনফুসিয়াসের সময়কাল পর্যন্ত, সর্বোত্তম শক্তিকে অভিহিত করা হত 'তি' (প্রভু) বা 'শ্যাং তি' (উর্ধ্বলোকের প্রভু) বলে। তবে কনফুসিয়াস কখনো 'তি' এর কথা বলেননি। পরিবর্তে তিনি 'তি'ইয়েন' (স্বর্গ) এর কথা বলতেন। নিশ্চিত হওয়ার জন্য, তাঁর 'স্বর্গ' অভীষ্ট লক্ষ্য এবং এটা সবকিছুর পরিচালক। তিনি পুনঃপুন তিয়েন-মিং, মাণ্ডেট, ইচ্ছা বা স্বর্গের বিন্যাসের কথা বলেছেন। তবে, তাঁর নিকট 'স্বর্গ' সকল আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে আর সর্বশ্রেষ্ঠ নন, যিনি আপন পদ্ধতিতে শাসন করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন সর্বোত্তম শক্তি যিনি শুধু শাসন করেন। এটাই হল সেই উপায়, যে অনুসারে সভ্যতাকে গড়ে তুলতে হবে এবং মানুষকে সেই ভাবেই আচরণ করতে হবে। কাজেই প্রকৃতি শুধুমাত্র প্রাকৃতিকই নয়, কিন্তু নৈতিকও। এটা শুধুমাত্র নির্দেশ করে না বস্তুজগত কেমন, বস্তুটিকে কেমন হয়ে উঠতে হবে তাও নির্দেশ করে। মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবন যাপন করতে হবে। জীবনের আদর্শকে বস্তুজগত যা আর এগুলিকে যা হয়ে উঠতে হবে তার 'উপায়ের' সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হবে।

সুতরাং, কনফুসীয় ধর্মের কল্পরাজ্য হলো এমন এক জগতের দর্শন, যেখানে সবাই ও সবকিছু প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে ঐক্যে বসবাস করে। প্রকৃতি নিজেই গতিশীল, ইয়াঙ (সূচনা) এবং ইন (সম্পূর্ণতা) এ দু'টির সম্পূরক নীতির দ্বারা প্রাণ-সঞ্চারিত। জীবন ও মৃত্যু এবং বৃদ্ধি ও হ্রাস একটি বিশ্বচক্রে বাঁধা। মানুষ যখন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখনই দুর্নীতি ও ক্ষমতার-খেলার আবির্ভাব ঘটে।

প্রকৃতির ধর্ম হচ্ছে, মিলনে সহবস্থান আর আমরা আহূত হয়েছি প্রকৃতির সঙ্গে মিলনে বসবাস করার জন্য।

খ্রীষ্টধর্ম ঃ ঈশ্বরের রাজ্য

এক নতুন খ্রীষ্টীয় সমাজের দর্শন লক্ষ্য করা যায় যীশু খ্রীষ্টের জীবনে – কথায় ও কাজে। যীশু তাঁর নতুন সমাজ ব্যবস্থার দর্শনকে আখ্যায়িত করেছেন 'ঐশরাজ্য' বলে। ইহুদীরা যারা তাঁর কথা শুনেছিল তাদের মনে ঐশরাজ্যের এই ধারণা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ ধারণা ঈশ্বর তাদের জন্য যেসব মহান কাজ করেছেন সে সংক্রান্ত তাদের স্মৃতিকে জাগরিত করেছিল।

তারা যখন মিশরে দাসত্বে ছিল, ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করেছিলেন। ঈশ্বর তাদের দুধ ও মধু প্রবাহিত দেশ দান করেছিলেন। ঈশ্বর তাদের সাথে একটি সন্ধি স্থাপন করে তাদেরকে করে তুলেছিলেন আপন সন্তানের ন্যায়। এমনকি যখন তারা অবিশ্বস্ত ছিল, অলীক যত দেবতাদের পিছনে ছুটে গিয়েছিল স্বার্থপরের মত, তখনও ঈশ্বর অনেক প্রবক্তাকে তাদের মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানাতে প্রেরণ করেছিলেন এবং নানা প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাদেরকে আবার তাঁর শাসনে আনার চেষ্টা করেছিলেন। ঈশ্বর তাদের পাপ প্রবণতা, এবং ভেদাভেদ, অন্যায্যতা, গরীবের প্রতি ধনীর অত্যাচারের ন্যায় সামাজিক পরিণতিগুলো জেনেও জুবিলীর ন্যায় একটি কাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে জনগণ সারা বছর অন্যায়ভাবে অধিগ্রহণ করা অন্যের জিনিস প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে পারবে এবং ভাই ও বোনদের একটি সমাজ হিসেবে পুনরায় শুরু করতে পারবে।

লোকদের অবিশ্বস্ততা সামাজিক কাঠামোকে এমন ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যে, ঈশ্বর তাদেরকে তাদের দেশ থেকে বহিঃস্কার করেছিলেন। যে দেশ ছিল তাদের পরিচয় এবং জীবিকা নির্বাহের উৎস সেই তা থেকে তাদের বহিঃস্কার করেছিলেন আর পাঠিয়েছিলেন নির্বাসনে। তথাপি, প্রবক্তাগণ তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির কথা শুনিয়ে আশ্বাস যোগাতেন এবং একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখাতেন, যেখানে ঈশ্বর যথা সময়ে যারা সেই সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তাদের পরিচালিত করবেন। ঈশ্বর তাদের এক নতুন হৃদয় ও নতুন আত্মা দান করবেন, দান করবেন এক নতুন জীবন, উর্বর ও সমৃদ্ধশীল এক নতুন দেশভূমি। ঈশ্বর একজন প্রেরিতদূতকে প্রেরণ করবেন দীনজনের নিকট মঙ্গলবাণী প্রচার করতে, ভগ্নহৃদয়কে সুস্থ করতে, বন্দীর কাছে মুক্তির বাণী ঘোষণা করতে এবং কারারুদ্ধদের মুক্ত করতে। ঈশ্বর এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী রচনা করবেন, যেখানে মানুষ পরম আনন্দ ও শান্তিতে বসবাস করবে। তাদের মিলন হায়না ও মেষশাবকের এক সঙ্গে চরে বেড়ানোর প্রতীকরূপ। ঈশ্বরের রাজত্ব জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আর সমস্ত মানুষের নিকট ছড়িয়ে পড়বে।

যীশু যখন ঐশরাজ্য কাছে এসে গেছে, মন পরিবর্তন কর আর মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর এমন কথা বলে তাঁর প্রচারকার্য আরম্ভ করেছিলেন, তখন জনগণ– যিনি প্রবক্তাগণের প্রবক্তা সেই তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা– স্মরণ করেছিল। তবে যীশুর প্রচারিত মঙ্গলসমাচার প্রবক্তাদের থেকে ভিন্ন ছিল। তিনি শুধু ভবিষ্যতের কোন রাজ্যের কথা প্রচার করেননি। তিনি তাঁর জীবন এবং অলৌকিক কাজের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ঐশরাজ্য এসে গিয়েছে, যদিও তার পূর্ণতা নির্ভর করবে জনগণের সাড়াদানের উপর।

যীশু নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত বিশেষ দূত হিসেবে দাবি করেছিলেন, যিনি দরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করেছিলেন, বন্দীদের মুক্ত করেছিলেন, এবং নির্যাতিতদের উদ্ধার করেছিলেন। তিনি মানুষকে তাদের রোগব্যাধি, মানসিক ক্লেশ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের ধিক্কার জানিয়েছিলেন, যা লোকদের দাসে পরিণত করেছিল। তিনি নেতাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন তাদের তথাকথিত বিধান, যেমন বিশ্রামবার, ও শুদ্ধিক্রিয়ার আচার-অনুষ্ঠান, প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে। তিনি সমাজে ধনী ও দরিদ্র, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে নির্যাতিতদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তিনি করগ্রাহক, পাপী, পতিতা এবং তাঁর সময়ের অবহেলিতদের সঙ্গ দিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে বসে খাওয়া-দাওয়াও করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রেমময় উদারতার মধ্যস্থতা করেছিলেন এবং এক-অন্যকে ভালবাসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম অপেক্ষা উদ্দেশের নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

যীশু-প্রচারিত ঐশরাজ্যের প্রকৃতি George Soares-Prabhu চমৎকারভাবে সারসংক্ষেপ করেছেন এ বলে ঃ মানুষের পক্ষে এই ভালবাসার আস্থাশীল গ্রহণযোগ্যতায় যখন ঐশপ্রেমের (স্বর্গরাজ্য) প্রত্যাদেশ এর উপযুক্ত সাড়া পায়, তখন ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে মুক্তির এক আন্দোলন শুরু হয়, যা মানব ইতিহাস পর্যন্ত বিস্তৃত। যেহেতু এই আন্দোলন স্বাধীনতা বয়ে আনে, তাই এটা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অভাব ও মোহ, যা তাকে শৃঙ্খলিত করে রাখে, তা থেকে তাকে উদ্ধার করে। এটা ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলে, কেননা এটা একটি প্রকৃত সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তিকে অন্যের প্রতি মমতা অনুশীলনে শক্তি যোগায়। এটা ন্যায্যতার দিকে টেনে নিয়ে যায়, কেননা এটা প্রতিটি সত্য সমাজকে ন্যায় সামাজিক কাঠামোসমূহ, যেগুলো স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব সম্ভব করে তোলে, এগুলো অবলম্বনে প্রণোদিত করে। Soares-Prabhu যেমনটি উল্লেখ করেছেন, যীশু যে ঐশরাজ্য আরম্ভ করেছিলেন তা ইতিহাসে একটি বাস্তব রূপ লাভ করবে শুধুমাত্র যখন লোকেরা এর প্রতি সাড়া দেবে, আর এটা তারা করবে মনের সত্যিকার পরিবর্তন ঘটিয়ে, যে পরিবর্তন দাবি করে অন্তরের পরিবর্তন আর অন্যায্য কাঠামোসমূহের পরিবর্তন, যে অন্যায্য কাঠামোগুলো আমাদের পাপময়তা এই পৃথিবীতে ও সমাজে গড়ে তুলেছে। কাজেই, যীশুর প্রচারিত মঙ্গলবাণী পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে যায়।

ঐশরাজ্যের একটি সুদূরপ্রসারী দর্শন প্রদান করার সময় আর তাঁর কাজের মাধ্যমে তাঁর সময়কালের উপযোগী কিছু বাস্তবধর্মী বিষয় নির্দেশ করার সময়, যীশু কিন্তু কোন পরিকল্পনা প্রদান করেনি, যা কি-না সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন মূল্যবোধের, যেগুলি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, কিন্তু প্রতিটি প্রজন্মে এ কাজটি কিভাবে করতে হবে, তা তিনি আমাদের বলেননি। তিনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর ঐশতাত্ত্বিক দর্শনকে আমাদের সামাজিক অবকাঠামোয় তর্জমা, ব্যাখ্যা করার। Soares-Prabhu আরও বলেছেন, যীশুর দর্শন আমাদেরকে আহ্বান জানায় বস্তুসম্পদ প্রতিষ্ঠিত পরাধীনতার (মানসিক ও সামাজিক) পৈশাচিক কাঠামোগুলোর বিরুদ্ধে বিরামহীনভাবে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য; এটা আরও আহ্বান জানায় অবিরাম সৃজনশীলতার প্রতি, যা প্রতিটি নতুন নতুন পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটাবে, একটি সমাজব্যবস্থার জন্য যা মানুষের সুসমাচারীয় দর্শনের সাথে অনেক বেশী সঙ্গতিপূর্ণ। যীশুর এক নতুন সমাজ দর্শন আমাদের সম্মুখে একটি অসমাপ্ত কাজ হিসেবে রয়ে যায় আর এটা আমাদেরকে আহ্বান জানায় স্থায়ী বিপ্লবের প্রতি।

ইসলামধর্ম ঃ বিশ্বজনীন উম্মা

ইসলামধর্ম অনুসারে, আল্লাহ্ নিজেকে ইতিহাসের

পরিক্রমায় বিভিন্ন নবীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। হযরত মোহাম্মদ হলেন সর্বশেষ নবী আর তাঁর বাণী সকল মানুষের জন্য। এই সার্বজনীনতার ভিত্তি হচ্ছে, আল্লাহ এক। তিনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই। কাজেই আল্লাহর বাণী সকল মানবজাতির জন্য। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সকল মানুষের কর্ম। যে-কেউ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, সে মুসলিম উম্মার অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মুসলমানই আল্লাহ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব সকল মানুষই সমান।

ইসলাম ঐতিহ্যের অন্যতম বিশিষ্ট আধুনিক বিশ্লেষক পাকিস্তানের Mawlana Sayyid Abul A'la Mawdudi "আল্লাহ শাসিত গণতন্ত্রের" কথা বলেছেন। শাসন করার অধিকার সমগ্র বিশ্বাসী সমাজের অন্তর্গত। কোন বিশেষ ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র বা শ্রেণীর অনুকূলে সংরক্ষণ বা বিশেষাধিকার বলে কিছু নেই। এই ধরনের একটি সমাজ শ্রেণীবিভক্তি মেনে নেয় না এবং জন্ম, সামাজিক পদমর্যাদা, পেশার ভিত্তিতে নাগরিকদের অক্ষমতা বা অযোগ্যতা অনুমোদন করে না। প্রশাসনিক সকল বিষয় আর সকল সমস্যা, শরীয়তী আইনে যে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না, মুসলিমদের ঐকমতে তার সুরাহা করতে হবে। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র, কেননা এখানে সকলে সমানভাবে দায়িত্ববান। এটাই আল্লাহ-শাসিত গণতন্ত্র, কেননা এটা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর ভিত্তি করে, আধুনিক গণতন্ত্রের মত জনগণের সার্বভৌমত্বের উপর ভিত্তি করে নয়। সকলেই আল্লাহর শাসনের অধীন। রাজনৈতিক সম-অধিকারের স্বীকৃতি ন্যায্যতা বোধের দিকে চালিত করে, যা ধনীদের উপর করারোপ করতে এবং বিধবা ও অনাথদের প্রতি বিশেষ ভাবনা প্রদর্শন করার জন্য সদা প্রস্তুত।

বিভিন্ন মতবাদ

ইউরোপে প্রথম সহস্রাব্দে এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগে, সমাজে মণ্ডলীর একটি শক্তিশালী ভূমিকা ছিল। রোমীয় সম্রাটগণ খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন সাম্রাজের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি। সাম্রাজ্য ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলে পোপগণ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকার দাবি করেছিলেন। মার্টিন লুথারের ন্যায় ধর্মসংস্কারকদের নানা আন্দোলন মণ্ডলীকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অবশেষে এই পরিস্থিতি ধর্মের নামে লড়াইয়ের দিকে মোড় নেয়, যেখানে বিভিন্ন রাজা ধর্মের নামে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই যুগ ইউরোপ কর্তৃক পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আবিষ্কার, সাম্রাজ্যের প্রসার, বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অভিবাসন প্রভৃতি দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির ফলে ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটে। পরিস্থিতিগুলোর এমন সম্মিলিত প্রবাহ উন্মেষ ঘটিয়েছিল একটি দ্বিমুখি উন্নয়নের। একদিকে, কৃষি ভিত্তিক সামন্ত প্রথা স্থান করে দিয়েছিল শিল্প-পুঁজিবাদকে। অন্যদিকে, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের ভাবধারা মণ্ডলীর প্রভাব বলয় থেকে মুক্তি কামনা করেছিল। এই যুগকে অনেক সময় বলা হয় আলোকিত যুগ।

পুঁজিবাদ হচ্ছে মূলত: মুষ্টিমেয় হস্তে সম্পদের কুক্ষিগতকরণ, যা নতুন বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি আর কৃষি-মজুর বা কলকারখানার শ্রমিকদের দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয়। গরীবদের শ্রমকে অন্যায়ভাবে শোষণ করা হয়। ধনী ও গরীবের মধ্য ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। অর্থ আরও অধিক অর্থ তৈরী করে। ধনীরাও উৎপাদন ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে নিজেদের সংগঠিত করে। তাদের জগত দর্শন অল্প কয়েকজন ধনীর সমৃদ্ধির উপর আলোকপাত করে।

একই সময়ে যুক্তিবুদ্ধির শক্তিকে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে দাবি করা হয়। বিশেষ বিশেষ ঐশ প্রত্যাদেশ, ধর্মগুলো যেগুলো দাবি করে, তা প্রত্যখ্যান করা হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি যুক্তিবুদ্ধির উপর নির্ভরশীলতা আর এর স্বশাসনকে অনুপ্রাণিত করে। এটা বলে, যা যুক্তি দ্বারা জানা সম্ভব নয় তার কোন অস্তিত্ব নেই। দার্শনিক ভাবনা যুক্তিবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যুক্তিবুদ্ধির ক্ষমতা স্বীকার করা মানে একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে মানব ব্যক্তির স্বকীয়তাকে স্বীকার করা। সংস্কৃতি ও ধর্মের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তি মুক্ত। সমাজ হল, স্বাধীনভাবে একত্রিত একটি জনসমষ্টি। সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করা। ধর্মকে গণ্য করা হয় যুক্তিবুদ্ধি ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রে, ঘোষিত স্বশাসনের

শত্রু হিসেবে। তাই যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধর্মের কবল থেকে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে সেই ব্যবস্থা প্রসারতা লাভ করে। এমনকি ধর্মকে বিরোধিতা ও দমন করা যেতে পারে যদি এটা ব্যক্তি ও তার যুক্তিবুদ্ধির স্বশাসনকে চ্যালেঞ্জের চেষ্টা করে।

কাজেই, ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদ এমন একটি ধারণা যা ধনী ও গরীব, পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের শ্রেণীতে বিভক্ত একটি সমাজ দর্শনে বিশ্বাস করে। তবে দুঃখজনক বিষয় যে, কিছু কিছু ধর্মীয় দল যেমন পুঁজিবাদের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, আর এগুলি এটা করছে সমাজে তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড ক্ষেত্র সুরক্ষিত রাখার জন্য।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে, পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচনার মধ্য দিয়ে কার্ল মার্ক্সের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এ কারণে যে, এটা অন্য এক জগতের কথা বলে আর পুঁজিবাদের মত অন্যায্যতাকে প্রশ্রয় দেয়। তিনি শিল্প-কলকারখানায় উৎপাদানের মূল নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি গুরুত্বারোপ করেছিলেন যে, উৎপাদন ও পুঁজির মাধ্যমসমূহের মালিকানার অধিকারী শ্রমিকদের হতে হবে। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই ব্যবস্থা অল্প কয়েকজনের হাতে পুঁজির মজুদকে প্রতিহত করবে, এবং জনগণের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে, একটি শ্রেণীবিহীন সমাজ গড়ে তুলবে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লব দিয়ে শুরু করে, মার্ক্সীয় তত্ত্ব একটি রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র গঠনের চেষ্টা চালিয়েছিল, যেখানে রাষ্ট্র গরীব শ্রমিকদের পক্ষে কাজ করবে বলে দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু এটা শ্রেণীবিহীন সমাজের কল্পরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিল।

পুঁজিবাদ ও মার্ক্সবাদ হচ্ছে বিশ্বজনীন সমাজকে ঘিরে এগুলোর নিজস্ব দর্শনসহ অ-ধর্মীয় মতবাদ। এগুলোর উদ্দেশ্য হল, ধর্ম যেসব বিশ্বজনীন দর্শনের কথা বলে তার থেকে আলাদা কিছুর প্রস্তাব করা। গুরুত্বপূর্ণ হল, বিংশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে ধর্মগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক মুক্তি আন্দোলন ধর্মহীন পুঁজিবাদ ও নিরীশ্বরবাদী মার্ক্সবাদকে বিরোধিতা করেছিল ।

রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজতন্ত্রবাদ হচ্ছে এ সকল মতবাদগত আন্দোলনের দু'টি ফসল, এগুলিকে আজকে যে-কোন বিশ্বজনীন সামাজিক দর্শনের অঙ্গ হয়ে উঠতে হবে। ধর্মীয় বহুত্ববাদ সর্বত্রই একটি বাস্তবতা হয়ে উঠছে। এটা আরও সংঘাতময়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধর্মের নামে সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে আজকে প্রায় সবাই একমত হবেন যে, ধর্ম যেহেতু প্রাইভেট আর এমনকি পাবলিক উভয় ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারে, তাই রাজনীতিতে এগুলোর কোন স্থান থাকা উচিত হবে না। একইভাবে, অধিকাংশ জনগণ যারা কি-না দরিদ্র এ ব্যাপারে একমত হবেন যে, গ্রহণীয় হয়ে ওঠার লক্ষ্যে, যে-কোন অর্থনৈতিক তত্ত্বকে মুষ্টিমেয় হাতে সম্পদের মজুদকরণকে অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে, আর সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে। পরে আরো বিস্তারিতভাবে এই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে এখানে আমাদের অবশ্যই জোর দিতে হয় যে, এই দু'টি নীতি বা মতবাদ, যেমন ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, দাবি জানায় ধর্মের সংস্কার, আর অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য যে-কোন সামাজিক দর্শনের অঙ্গ হতে হবে। এগুলোর উৎসের নানা পরিস্থিতি সত্ত্বেও এগুলো কিন্তু ধর্মের বিরোধী নয়। বাস্তবিকপক্ষে, আজকে অনেক ধর্মে অধিকাংশ প্রগতিশীল আন্দোলন এ সকল মতবাদকে সমন্বিত করার চেষ্টা করে।

উপসংহার

এখানে দু'টি প্রধান মতবাদ এবং কয়েকটি ধর্মের – বিশ্বজাগতিক ধর্ম আর পাঁচটি প্রভাবশালী ধর্মীয় ঐতিহ্য, যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, কনফুসীয়, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম – বিশ্বজনীন সামাজিক দর্শন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মগুলোর এক ঈশ্বরে বা এক পরম সত্তায় বিশ্বাস স্বীকার বিশ্বাসীগণকে অনুপ্রাণিত করে সকলকে সেই একই ঈশ্বর/পরম সত্তার ছায়াতলে আসতে। এই অর্থে বলা যায় যে, প্রতিটি ধর্মেরই বিশ্বায়ন ঘটছে। আজকে প্রতিটি ধর্মকে রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে। এর অর্থ হল, বিশ্বায়ন, যা প্রতিটি ধর্মই বাসনা করে, সেই তা ঘটে সমতা আর বিভিন্নতার গ্রহণ ও বিস্তার ঘটানোর মাধ্যমে নয়, কিন্তু একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির – এগুলোর নিজস্ব – কর্তৃত্বের মাধ্যমে । হয়তবা এ কারণেই এগুলো

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সাহায্যের শরণাপণ্ন হতে দ্বিধা করে না।

যখনই আমরা বিশ্বজনীন দর্শনের কথা বলি, তখন আমরা অবশ্যম্ভাবীভাবে বিশ্বায়নের ঘটনার কথা চিন্তা করি। আজকের দিনে বিশ্বজাগতিক কিংবা সার্বজনীন একতার জন্য যে-কোন অন্বেষণ প্রচেষ্টা আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। এই পর্যায়ে প্রতিটি ধর্মই বিশ্বজনীন নানা দৃষ্টিভঙ্গির যোগান দিয়ে অবদান রাখতে পারে। এগুলোর মধ্যে সংলাপ পারস্পরিক বোঝাপড়া, সমৃদ্ধি ও সহযোগিতার দিকে চালিত করতে পারে। এ ধরনের ভিত্তির উপর ভর করে বিশ্বায়ন নিঃসন্দেহে বিশ্বজনীন ঐক্যকে এগিয়ে নেবে।

বিশ্বায়নের ধারণাকে নিঃসন্দেহে বরণ করে নেওয়া হয় না যদি তা একটি বিশেষ সংস্কৃতি, মতবাদ, দেশ বা অর্থনীতি ব্যবস্থার বিশ্বায়নের বিষয় হয়। এই ধরনের বিশ্বায়নের লক্ষ্য হল অন্যান্য সংস্কৃতি, মতবাদ ইত্যাদির অধীনতা। সমসাময়িক পৃথিবীতে, একটি উদার পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দ্বারা পরিপুষ্ট একটি ভোগবাদী সংস্কৃতি গণমাধ্যম শক্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা, অস্ত্রবলের সাহায্যে জগতকে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করে। পৃথিবীর অন্যসব মানুষ ও তাদের সংস্কৃতিকে প্রান্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়। যখন তারা শক্তিশালী নয়, তখন তাদের স্বতন্ত্র পরিচিতিগুলোও হারিয়ে যাওয়ার দিকে ধাবিত হয়। এইভাবে বিশ্বায়ন বিবর্ণ একরঙা চিত্রের আনয়ন ঘটায়।
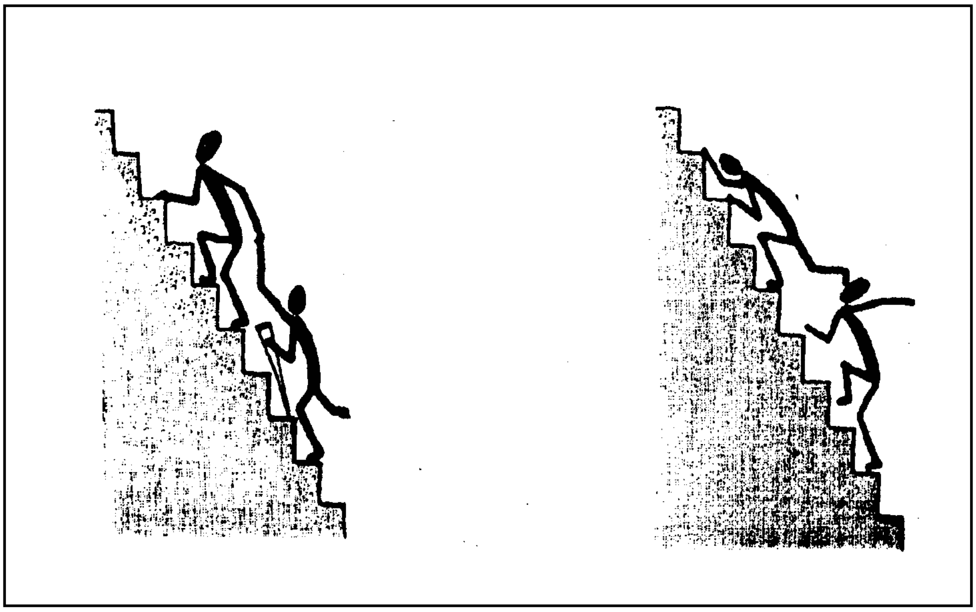
তবে বিশ্বায়নকে প্রভুত্বশালী ও একচেটিয়া হয়ে উঠতে হবে না। বিশ্বব্যাপী ঘনিষ্ঠতা আর গণমাধ্যম ও যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের দ্রুত বিকাশলাভের মত বিষয়গুলোও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ও তাদের সংস্কৃতিকে একটি বিশ্বজনীন সমাজে একত্রিত করতে পারে, যে সমাজ তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়কে সম্মান ও রক্ষা করবে। বিশ্বায়নের আরও অর্থ হতে পারে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও বহুত্ববাদের বাস্তবতায় বিশ্বজনীন সংহতি ও পারস্পরিকতা।